দেবীত্রয়ী

সুব্রতা সেন

পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যশোধরার সঙ্ঘজীবন সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, মুখ্যত নিরাপত্তার অভাবেই মহাপ্রজাবতী গৌতমীর নেতৃত্বে শাক্য নারীরা বহু ক্লেশ স্বীকার করে সঙ্ঘে যোগদানের আবেদন নিয়ে ভগবান বুদ্ধের কাছে এসেছিলেন। সকল নারীর মুখপাত্রী ছিলেন বর্ষীয়সী গৌতমী মাতা। আনন্দের সনির্বন্ধ অনুরোধে প্রধানত তাঁর কথা বিবেচনা করে তথাগত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নারীদের সঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন।

মাতা গৌতমী ভিক্ষুণীরূপে বিশেষ সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। স্বয়ং বুদ্ধ তাঁর সঙ্ঘভুক্তির অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। মহাপ্রজাবতী একশো পঁচিশ বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় আটাত্তর বছর বয়সে যশোধরার দেহত্যাগ হয়। সুতরাং যশোধরার পক্ষে সঙ্ঘমুখ্যারূপে ভিক্ষুণীদের পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না, যদিও তিনি কপিলাবস্তুর প্রাসাদে বিপুলসংখ্যক নারীর কর্ত্রী ছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে যে-সামান্য তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাতেই যশোধরার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের সবচেয়ে মুগ্ধ করে তাঁর মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, অনাসক্তি ও ত্যাগময় জীবনের প্রতি সহজ আকর্ষণ, প্রখর বাস্তববোধ এবং সত্যসুন্দর বাক্যবিন্যাস। চরিত্রবলই যে মানুষকে রক্ষা করে, বহিরঙ্গ অবগুণ্ঠন নয়—একথা তিনি স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করেছেন এবং তা নির্দ্বিধায় ব্যক্তও করেছেন। ধর্মবল সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ আত্মবিশ্বাস একজন বিরহক্লিষ্টা নারীর স্বাভাবিক ব্যাকুলতাকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজের ও সন্ন্যাসী স্বামীর মর্যাদারক্ষায় দৃঢ়চিত্ত করে তুলেছে। এই আত্মমর্যাদাবোধ ভারতীয় নারীর নিজস্ব সম্পদ। যুগে যুগে সীতা, দ্রৌপদী, কালিদাসের কুসুমপেলবা শকুন্তলার মধ্যে যা দেখা গেছে, বিষ্ণুপ্রিয়াজীর রোদনপরা তপস্বিনী রূপের মধ্যেও যা অম্লান, শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে তার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখে আমরা ধন্য হয়েছি।

রাজবধূ হওয়া সত্ত্বেও সর্বার্থসিদ্ধের গৃহত্যাগের পরে ব্রহ্মচারিণীর জীবন বরণ করতে যশোধরা ক্ষণকালের জন্যও দ্বিধাগ্রস্ত হননি। এ-জীবনের কৃচ্ছ্রতা ও মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা ছিল না। প্রব্রজ্যাগ্রহণে উন্মুখ বালক রাহুলকে তিনি যেভাবে সতর্ক করেছেন, যেসব উপদেশ দিয়েছেন তা যেমন তাঁর বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় বহন করছে তেমনই তাঁর গুরুশক্তির স্পষ্ট আভাস দিচ্ছে। রাহুলকে উপদেশ দেওয়ার সময় যশোধরা রাজকুলের অন্তঃপুরিকা মাত্র, কিন্তু তাঁর

উপদেশাবলি শুনলে মনে হয় তিনি যেন ভিক্ষুজীবনের অভ্যস্ত পথিক। সঙ্ঘমুখ্যা তিনি ছিলেন না, কিন্তু ভদ্দকচ্চানা থেরীরূপে তাঁর জীবনচর্যা সবার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। নারীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই দুর্লভ ঋদ্ধি ও সিদ্ধিলাভে ধন্য হয়েছিলেন। বিষয়তৃষ্ণা জয় করে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে তাঁর নির্বাণলাভ বৌদ্ধসঙ্ঘের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যশোধরার স্বল্পতথ্য সম্বলিত জীবনকথা আমাদের অতৃপ্ত করে। আধুনিক যুগে জন্মগ্রহণ করলে এই মহীয়সী নারীর চরিত্রদীপ্তিতে সমগ্র বিশ্বই উদ্ভাসিত হত।

খুব পারিভাষিক অর্থে বিচার করলে অবতারলীলাসঙ্গিনীরূপে যশোধরাকে উল্লেখ করা কতদূর সমীচীন এ-বিষয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে, কারণ ভগবান বুদ্ধ জন্মান্তরবাদ স্বীকার করলেও অবতারবাদ গ্রহণ করেননি। এ-প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি প্রতিবাদী ধর্মের উত্থানের ফলে যেমন কর্মকাণ্ডানুরাগী ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনই পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মও ক্রমশ ভগবান বুদ্ধ-প্রবর্তিত নির্বাণের পথ ও অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন থেকে বেশ খানিকটা সরে এসেছে। পুরাণসাহিত্যের জনপ্রিয়তা স্মৃতিকারেরাও এড়িয়ে যেতে পারেননি। মহামহোপাধ্যায় কাণের মতে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধধর্মের চরম বিকাশ লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধরা যখন ভক্তিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ল, বোধিসত্ত্বগণের সৎকর্মের মাধ্যমে ক্রমবিকাশ যখন বিশেষরূপে গুরুত্ব পেল, তখন বৌদ্ধধর্ম ও জনপ্রিয় (পৌরাণিক) হিন্দুধর্মের ভেদরেখা ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে শেষে একেবারে মুছে গেল। কাণের পর্যবেক্ষণেই ধরা পড়েছে, সপ্তম শতাব্দী থেকেই হিন্দুরা বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতারজ্ঞানে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছেন এবং দশম শতাব্দীর মধ্যেই সারা ভারতে বুদ্ধ হিন্দু অবতাররূপে পূজিত হচ্ছেন, যা নির্দ্বিধায় প্রকাশিত হয়েছে দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেব বিরচিত অতিপরিচিত 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে—'কেশবধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।'

এই দৃষ্টিকোণ থেকে যশোধরাকে অবতার-লীলাসঙ্গিনী বলা বোধ হয় খুব দোষের হয় না।

দেবী যশোধরার মতো অত প্রাচীনকালের না হলেও দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বল্পজ্ঞাত নীরব জীবনের ঘটনাবলি নিয়ে মতপার্থক্যের অবধি নেই। এই বাদানুবাদের অংশীদার যেমন আধুনিক পণ্ডিতবর্গ, তেমনই প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থ রচয়িতারাও। সাধারণ পাঠক যে-প্রাচীনগ্রন্থগুলিতে বিষ্ণুপ্রিয়া সংক্রান্ত তথ্যের সন্ধান পান, অন্য প্রাচীনগ্রন্থগুলি সে-বিষয়ে নীরব। হয়তো সেই কারণেই আধুনিক গবেষকদের এক বৃহৎ অংশের কাছে বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যগুলির অনেক অংশই সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক বলে উপেক্ষিত হয়েছে।

রসপিপাসু ভক্তবৃন্দের কাছে হয়তো এই বিতণ্ডার আদৌ কোনও মূল্য নেই, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াজীর জীবনালেখ্য তুলে ধরতে গিয়ে বর্তমান নিবন্ধে যে-দুটি বিতর্কিত ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে পাঠকের কাছে কৈফিয়ত দেওয়ার দায় এড়িয়ে যাওয়া চলে না। তাছাড়া আলোচনার শুরুতেই দেবীত্রয়ীর মাতৃভাব ও গুরুভাবের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়েছিল, তা পূরণের উদ্দেশ্যেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষত্ব ও শাখাভেদের কিছু পরিচয় দেওয়ার দরকার আছে। এই শাখাভেদের বৈচিত্র্যের মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অবস্থান নির্ণয় করাও খুব সহজসাধ্য নয়।

বিষ্ণুপ্রিয়াজী সম্পর্কে উল্লিখিত দুটি বিতর্কিত প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা যাচ্ছে। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে বলা হয়েছে, মহাপ্রভু যে-রাত্রিশেষে গৃহত্যাগ করেছিলেন সেই রাত্রে

নিজে বিষ্ণুপ্রিয়াজীকে সাজিয়েছিলেন এবং যথেষ্ট স্নেহাদর প্রদর্শন করেছিলেন। এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে আধুনিক গবেষকগণ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে ব্যাপারটির উল্লেখ নেই, বরং আছে সে-রাত্রে 'নিকটে শুইলা হরিদাস, গদাধর'। মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীখণ্ডের নরহরির পদাশ্রিত ও তাঁর বংশের উত্তরসূরী গৌরগুণানন্দ ঠাকুর তাঁর 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' শীর্ষক গ্রন্থে জানিয়েছেন, নরহরির প্রিয়পাত্র লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে বর্ণিত বৃত্তান্ত সম্বন্ধে সন্দিহান বৃন্দাবনদাস তাঁর মা নারায়ণী দেবী (শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী)-কে ঘটনার সত্যাসত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে মা বলেন, ''লোচন যাহা লিখিয়াছে তাহা অতি সত্যঘটনা, আমি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর নিকট নিজে একথা শুনিয়াছি এবং আমার একথা বেশ স্মরণ আছে।'' বৃন্দাবন তখন লোচনকে সপ্রেমে আলিঙ্গন করলেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে লোচনের গ্রন্থের নাম বজায় রেখে নিজের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থের নাম বদলে 'চৈতন্যভাগবত' রাখলেন। এরপর লোচন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কাছে গেলেন। তাঁর সস্নেহ অনুমোদনে লোচনের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' প্রকাশিত হল।

দ্বিতীয় বিতর্কিত বিষয় যা এই প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে তা হল—সন্ন্যাসের পাঁচ বছর পর শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান দর্শন করতে নবদ্বীপে এসেছেন এবং শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিজের পাদুকা প্রদান করেছেন। আধুনিক গবেষকদের মতে সন্ন্যাসের পর তিনি আদৌ নবদ্বীপেই আসেননি, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে অবস্থান তো দূরের কথা! পাদুকা সম্পর্কে যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর বক্তব্য, নিজগৃহে শ্রীচৈতন্যদেবের একাধিক পাদুকা থাকতেই পারে, সেইরকম একজোড়া পাদুকা বিষ্ণুপ্রিয়াজী পূজা করেছেন—এ তো অসম্ভব নয়। 'অসমোর্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থকার নবদ্বীপের বড় পাঠকবাড়ির হরিদাস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, নিমাইয়ের গৃহত্যাগের পর তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র বিরহবিদীর্ণ ভক্তেরা নিয়ে যেতে লাগলেন। সেসময় গৃহের অভিভাবকতুল্য সেবক ঈশান, প্রভুর শয়নগৃহ থেকে তাঁর পাদুকাযুগল সংগ্রহ করে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে দেন। তিনি তদবধি অশ্রুজলে অভিষিক্ত করে সেই পাদুকারই পূজা করেছেন।

বর্তমান আলোচনায় সন্ন্যাসের পাঁচ বছর পর শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপে আগমনবৃত্তান্ত মুখ্যত লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল থেকে নেওয়া হয়েছে। শ্রীল হরিদাস গোস্বামী তাঁর 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াচরিত' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গ লোচনদাস-প্রামাণ্যেই গ্রহণ করেছেন কারণ অন্যান্য গ্রন্থে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া সম্পর্কে তথ্য নিতান্তই অপ্রতুল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত স্নেহধন্য সন্তান সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজ তাঁর 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব' শীর্ষক গ্রন্থের জননী ও জন্মভূমি সন্দর্শন অধ্যায়ে মহাপ্রভুর নবদ্বীপে পুনরাগমন ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে পাদুকাপ্রদান-বৃত্তান্তের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, তাঁর এই স্বীকৃতি আমাদের মতো সাধারণ ব্যক্তিদের অনেকখানি আশ্বস্ত করেছে।

আধুনিক পণ্ডিতদের অনেকে মনে করেন, এই পাদুকাপ্রদান কাহিনি পরমবৈষ্ণব ভক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের 'অমিয়নিমাইচরিত' গ্রন্থে বর্ণনার পরে বৈষ্ণবসমাজে জনপ্রিয় হয়েছে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে শিশিরকুমার ঘোষের দেহত্যাগ হয়। হরিদাস গোস্বামী যে শিশিরবাবুর যথেষ্ট গুণগ্রাহী ছিলেন তা তাঁর গ্রন্থের ভূমিকা থেকে স্পষ্ট। গোস্বামীজীর গ্রন্থ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের রচনা। পাদুকাপ্রদানের ব্যাপারে গোস্বামীজী কিন্তু তাঁর অব্যবহিত পূর্বসূরী শিশিরবাবুকে উদ্ধৃত করেননি। তিনি উদ্ধৃত করেছেন 'চৈতন্যতত্ত্বদীপিকা' গ্রন্থের একটি সংস্কৃত শ্লোক। এই দীপিকার লেখক নবদ্বীপ

নিবাসী শশিভূষণ গোস্বামী নিজের পরিচয় দিচ্ছেন বিষ্ণুপ্রিয়াজীর ভ্রাতা যাদবাচার্যের শিষ্য মাধবাচার্যের শিষ্য-প্রশিষ্য-অনুশিষ্যরূপে। দীপিকাকারের লেখায় আর একটি তথ্য আছে যে শ্রীচৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়াজীকে স্বয়ং দীক্ষা দিয়েছিলেন—''দীক্ষিতা প্রভুনা তেন পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বয়ং।/ সিদ্ধিমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ॥/ ইতিশাস্ত্রবলাদ্ধেতোঃ স্বভার্যামুপদিষ্ট-বান্।'' (শ্রীরামকৃষ্ণও দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালে শ্রীমায়ের জিহ্বায় মন্ত্র লিখে দীক্ষা দিয়েছিলেন।)

আধুনিক লেখক-গবেষকদের মধ্যেও মতৈক্য নেই। 'অসমোর্ধ্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থের লেখক মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন, শচীমাতার দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই মিশ্রগৃহ গঙ্গাগর্ভে চলে যাওয়ার উপক্রম হলে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, তাঁর পিতামাতা ও ভ্রাতার সঙ্গে গৃহদেবতা, শ্রীচৈতন্যপাদুকা ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ ঈশানকে নিয়ে মালঞ্চপাড়ায় তাঁর পিতৃগৃহে চলে গেলেন। যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গৌরগৃহ গঙ্গায় বিলীন হয়ে গেল। এই বৃত্তান্তে শ্রীগৌরাঙ্গের দারুমূর্তি বা বংশীবদনের কোনও প্রসঙ্গ নেই।

নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান নিয়ে প্রভূত বিতর্কের মূল কারণ অবশ্যই ভাগীরথীর বারে বারে গতিপথ পরিবর্তন। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী তাঁর 'শ্রীচৈতন্য ও সমকালীন নবদ্বীপ' গ্রন্থে নির্মোহ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিভিন্ন বিরুদ্ধ মতের বিস্তৃত পর্যালোচনা করে যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা গ্রহণ না করে উপায় নেই। এ থেকে জানা যায় নবদ্বীপের উত্তরাংশে ব্রাহ্মণপল্লি ছিল, তারপরেই ছিল বৈদিকপল্লি যেখানে জগন্নাথ মিশ্রের পরিবার বাস করতেন। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে নবদ্বীপের উত্তরে প্রথম ভাঙন হয়; তখন উত্তরাংশের বাসিন্দারা দক্ষিণাংশে সরে আসেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দেহত্যাগ বড়জোর ১৫৬০-৭০-এর মধ্যে। কাজেই তাঁর জীবদ্দশায় গৌরাঙ্গগৃহ গঙ্গাবাহিত হয়েছিল একথা আদৌ মানা যায় না। তবে ১৭৮০-র ভাঙনে গৌরগৃহ অবলুপ্ত হয়েছিল—এই মত অসমীচীন নয়। স্বামী সারদানন্দ প্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ থেকে জানা যায়, মথুরবাবুর সঙ্গে নবদ্বীপধাম দর্শন করতে গিয়ে কোথাও কিছু অনুভব করতে না পেরে শ্রীরামকৃষ্ণ বিষণ্ণবোধ করেন। পরে ফেরার সময় গঙ্গাবক্ষে নৌকায় থাকাকালীন ভাবাবেশে গৌর-নিতাইয়ের উজ্জ্বল রূপ দর্শন করে স্থিরপ্রত্যয় হন যে শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়েছে।

এখন নির্ণেয়, শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অবস্থান ও অবদান কী।

শ্রীচৈতন্যের উপাস্য শৃঙ্গাররসরসিক শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর মুখ্যবিবেচ্য শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা যেখানে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যবিস্মৃতি ঘটেছে, ফলে মাধুর্যের পরাকাষ্ঠায় কৃষ্ণলীলার চমৎকারিত্ব উন্মোচিত হয়েছে। একদিকে শ্রীচৈতন্য যেমন বৃন্দাবনের নন্দগোপকে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপিতা ও যশোদা দেবীকে নিত্যমাতারূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন, অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের রসঘনবিগ্রহত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে মহাভারত ও পুরাণের প্রতিকূল অংশ অস্বীকার করেছেন। শ্রীচৈতন্যপার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্যকে অবলম্বন করে একটি নাটক লেখার সংকল্প করলে মহাপ্রভু নির্দেশ দিলেন—'কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিও ব্রজ হইতে।' বিবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেক্ষিতে বলা যায়, শ্রীচৈতন্য রসপারম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

রূপ-সনাতন প্রমুখ বৃন্দাবনের গোস্বামীবৃন্দ শ্রীচৈতন্যের বিচিত্র ভাববিলাস দেখে রাগভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও মহাপ্রভুর অন্তঃকৃষ্ণ ও বহির্গৌরসত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁরই নির্দেশে শ্রীকৃষ্ণলীলাতত্ত্বকেই নতুন আলোকে উপস্থাপিত করেছিলেন। বৃন্দাবনের পরিকরগণের প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য প্রদর্শিত পথে নবকলেবরে স্মৃতি,

ব্যাকরণ, অলংকার প্রভৃতি শাস্ত্র এবং কাব্যনাটক ইত্যাদি রচিত হল। ভাগবতের ব্যাখ্যা ও নূতন রসশাস্ত্র প্রণয়ন করে তাঁরা যে-নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বিশেষত শ্রীজীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভে যে-বিচারধারা প্রবর্তিত হয়েছে—এসবের নির্যাস হল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন। ঈশ্বরের সঙ্গে জীব-জগতের সম্বন্ধ নির্ণয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে এই দার্শনিক তত্ত্বকে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' নাম দেওয়া হয়েছে। এসব রচনা শ্রীকৃষ্ণকেন্দ্রিক, এর মধ্যে গৌরমাহাত্ম্য প্রচারের কোনও প্রয়াস নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুতে বৈপ্লবিকতা ও রক্ষণশীলতার যুগপৎ সমন্বয় দেখা গেছে। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মধ্যেও ওই ভাব প্রকট। শান্তিপুরের অদ্বৈতমহাপ্রভুকেও সমন্বয়বাদী বলা যেতে পারে। এঁরা মধ্যপন্থী।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেকে অবতার বলে কখনও প্রচার করেননি। নিজের গুণাবলি ভক্তমুখে শুনলেও বিরক্ত হতেন। তবুও উত্তরকালে তাঁকে অবলম্বন করে একাধিক উপাসনার ধারা প্রচলিত হয়েছে। মহাপ্রভু বঙ্গভূমি ছেড়ে চলে গেলে ক্রমে ক্রমে প্রবীণ ভক্তরাও নবদ্বীপ ছাড়লেন। অদ্বৈতপ্রভু পাকাপাকিভাবে শান্তিপুরেই রয়ে গেলেন। শ্রীবাস চলে গেলেন কুমারহট্টে। নিত্যানন্দ খড়দহে অধিষ্ঠান করে বর্ণাশ্রম ধর্মভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে ভক্তির বন্যায় ভাসিয়ে দিলেন। তাঁর অপূর্ব প্রেমভক্তি দর্শনে মুগ্ধ বঙ্গীয় ভক্তমণ্ডলী গৌরনিতাই যুগলমূর্তির পূজা আরম্ভ করলেন। ওদিকে শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিকর শ্রীখণ্ডের নরহরির প্রেরণায় গৌরপারম্যবাদ শুরু হয়ে অবশেষে তা গৌরনাগরবাদে পর্যবসিত হল। গৌরপারম্যবাদী ভক্তেরা শ্রীগৌরাঙ্গকে পরতত্ত্বসীমা বলে মনে করেন। তাঁরা কৃষ্ণলীলার চেয়ে গৌরলীলার উৎকর্ষ প্রমাণের পক্ষপাতী। দৃষ্টান্তস্বরূপ চৈতন্যচন্দ্রামৃতের (১২০ নং শ্লোকের আনন্দীটীকার) উদ্ধৃতি দেওয়া চলে—''যতঃ সর্বতঃ শ্রীভগবল্লীলা সুরসা, ততঃ কৃষ্ণলীলা সুরসতরা, ততোঽপি গৌরলীলা সুরসতমা। অতঃ শ্রীগৌরপদাম্বুজমেবোপাস্যমিতি।''

শ্রীমহাপ্রভুর জীবদ্দশায় বংশীবদনের সক্রিয় সহযোগিতায় ১৪৩৫ শকাব্দে (১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে) নির্মিত ও বিষ্ণুপ্রিয়াজীর নিভৃতে পূজিত দারুমূর্তিই শ্রীগৌরাঙ্গের আদি বিগ্রহ। (মূর্তির শাস্ত্রসম্মত নিত্যপূজার ভার দেবী নিজভ্রাতা যাদবাচার্যকে দিয়েছিলেন।) প্রিয়াজীর পূজা দিয়েই গৌরাঙ্গ-ভজনের সূত্রপাত। তবে প্রিয়াজীর মূর্তিনির্মাণ ও গৌরাঙ্গপূজন তাঁর একান্ত সাধনার ধন, যদিও কলিহত জীবের কল্মষ দূর করার উদ্দেশ্যে গৌরাঙ্গভজনের সূত্রপাত ঘটিয়ে গেলেন—একথা তিনি মাতৃসমা সীতা দেবীকে জানিয়েছিলেন।

লক্ষণীয়, বিষ্ণুপ্রিয়াজীর গৌরাঙ্গভজনে কোনও উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারের প্রসঙ্গ নেই, যা গৌরপারম্যবাদীদের আছে। প্রিয়াজীর সাধনে কেবল আত্মনিবেদন ও অশ্রুবিসর্জন। শ্রীচৈতন্য যেমন বৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণলীলার আস্বাদনের পক্ষপাতী ছিলেন তেমনই গৌরপারম্যবাদীরা নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত গৌরাঙ্গলীলারই আস্বাদনে উন্মুখ; সেজন্য সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য নন, নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গই তাঁদের উপাস্য। এক অজানা পদকর্তার ভাষায়—''গৌর ভজবি যদি নিরবধি গৌরচাঁদকে নদীয়া বাহির করিস না রে ভাই।'' শ্রীখণ্ডের আচার্য নরহরির স্পষ্ট উপদেশ—''গৌর ভজহ, গৌর সাধহ, গৌর করহ সার/ গৌর বলিতে জনম যাউক কিছু না চাহিয়ে আর।'' এদিক দিয়ে দেখতে গেলে বিষ্ণুপ্রিয়াজীর গৌরাঙ্গমূর্তি নির্মাণ ও গৌরাঙ্গভজন গৌরপারম্যবাদীদের পথ সুগম করেছে বলা যায়।

গৌরপারম্যবাদের ফলে কিন্তু গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সর্বভারতীয় মান্যতা হারাল। নারদ পঞ্চরাত্র, ভাগবত, গীতার বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় বৈষ্ণবগণের চতুঃসম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য ও নিম্বার্ক

বা নিম্বাদিত্য এই চতুঃসম্প্রদায়ের প্রধান প্রবক্তা। আর যত সম্প্রদায় আছে সবই এই চারটি প্রধান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলে বিবেচ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব অংশত সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও গৌরপারম্যবাদে শ্রীগৌরাঙ্গ থেকে শ্রীকৃষ্ণের ন্যূনতা স্বীকৃত হওয়ায় তা সর্বজনগ্রাহ্য হল না, আঞ্চলিক এক সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হল। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সন্ন্যাসগুরু কেশবভারতী, শংকরাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীও তাই। শোনা যায়, শ্রীচৈতন্যকে 'তৎ ত্বমসি' মন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। মতান্তরে তিনি স্বপ্নে ওই মন্ত্র লাভ করেছিলেন। তিনি এই মন্ত্রকে মন থেকে গ্রহণ করতে পারছিলেন না কারণ তাহলে তাঁর প্রাণস্বরূপ ভগবান হরির পূজা ত্যাগ করতে হয়, সেক্ষেত্রে মুরারি গুপ্তের পরামর্শ হল, 'তৎ ত্বমসি' কে 'তস্য ত্বমসি' রূপে ব্যাখ্যা করো, তাহলে 'তুমি সেই পরব্রহ্ম' না ভেবে 'তুমি সেই পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীহরির দাস' এভাবে চিন্তা করতে পারবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, সনাতন গোস্বামীও এই দ্বিতীয় প্রকার অর্থই গ্রহণ করেছেন।

আগেই বলা হয়েছে, শ্রীখণ্ডের শ্রীচৈতন্যপার্ষদ নরহরি সরকার ও তাঁর অনুগামীদের দ্বারা গৌরপারম্যবাদ ক্রমে গৌরনাগরবাদে পর্যবসিত হল। নিজেকে রসচতুরা নারী মনে করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে ওই রসের বিষয়রূপে চিন্তনের নাম নাগরভাব। নাগর শব্দে উপপতিত্ব ও পরকীয়া প্রেম বোঝায়। গৌরনাগরবাদে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপগোপীদের লীলার অনুকরণ করে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে তাঁর পরিকরদের লীলা আরোপের মাধ্যমে মধুর রস আস্বাদনের চেষ্টা হল। কবি কর্ণপুর তাঁর 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় বৃন্দাবনলীলায় অংশগ্রহণকারী কৃষ্ণপরিকরগণকে শ্রীচৈতন্যলীলায় পুনরাবির্ভূত বলে মনে করেছেন এবং কে কোন জন তার একটি বড় তালিকা দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য নিজে 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত', বহিরঙ্গে রাধা অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ, তিনি সবসময় শ্রীকৃষ্ণের জন্যই আর্তি জানিয়েছেন, শ্রীরাধার জন্য কখনই নয়। সর্বোপরি তিনি অতি কঠোর সন্ন্যাসী— সেক্ষেত্রেও তাঁকে শ্রীকৃষ্ণরূপে আস্বাদন করার জন্য শ্রীরাধাচরিত্র খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না। সংকীর্তনের সময় গদাধর তাঁর বামদিকে ও নরহরি ডান দিকে থাকতেন। নাগরবাদীরা গদাধরের সংবেদনশীলতা লক্ষ করে তাঁকে রাধাভাবে ভাবিত বলে ভেবেছেন, নরহরি হয়েছেন গোপী মধুমতী। বৃন্দাবনলীলায় পরকীয়া প্রেমের উৎকর্ষ দেখানো হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের প্রথমা পত্নী লক্ষ্মী দেবী এবং দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী দুজনেই স্বকীয়া সুতরাং কবি কর্ণপুর এঁদের দুজনকে যথাক্রমে রুক্মিণী দেবী (যিনি প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুপত্নী শ্রীদেবী) এবং সত্যভামা দেবী (যিনি বিষ্ণুপত্নী ভূদেবী) রূপে চিত্রিত করেছেন। নাগরী বা গোপীভাবে যুগলরূপ সেবা করার প্রেরণায় তাই কেউ কেউ গৌরগদাধরের পূজা করে থাকেন। ক্রমে কিন্তু গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পূজনও বাকি রইল না। নাগরবাদ নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গকে অবলম্বন করেই প্রচলিত ও প্রসারিত। সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে নাগরবাদীদের কোনও দায়বদ্ধতা নেই। নরহরি আটজন নবদ্বীপ-নাগরীর সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে নবনাগরী বলে এবং লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর শক্তি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মধ্যে সংপ্রবিষ্ট আছে বলে প্রচার করেছেন। পদকর্তা নবদ্বীপদাসের ভাষায়—''বিষ্ণুপ্রিয়া আদি করি, নবদ্বীপ সুনাগরী/ গোরা রসে নিমগ্ন সদাই।''

ধীরে ধীরে নাগরবাদের সূত্র ধরে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগলরূপের অর্চনা জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এই জনপ্রিয়তার সহায়ক হল নানারসসিক্ত সংকীর্তনের সম্প্রচার ও বহু পদকর্তার সুললিত পদমঞ্জরী। শ্রীভক্তিরত্নাকরে (১ম তরঙ্গ) বলা হয়েছে—

''অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরারায়/ কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥" শ্রীচৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাসও লিখলেন—''অদ্যাপিহ শ্রীচৈতন্য এসব লীলা করে/ যার ভাগ্যে থাকে সেই দেখে নিরন্তরে॥" দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর্ধানের পর গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্তি স্থাপনা করে তার পূজা শুরু হল। প্রথম যুগল বিগ্রহ বোধহয় প্রতিষ্ঠিত হয় খেতরিতে, খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে। শোনা যায়, খেতরিতে ঠাকুর নরোত্তম মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ পেয়ে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠার উৎসব বিপুল উদ্দীপনা ও সমারোহ সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে খড়দহ থেকে শিষ্যসহ নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবা দেবী এবং অম্বিকা, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কাটোয়া, যানিগ্রাম ও শ্রীখণ্ড থেকে বহু গৌরভক্ত এসেছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমায় অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মতিথিতে এই বিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। জাহ্নবা দেবী ভোগ রন্ধন করেছিলেন। কয়েকদিন ধরে উৎসবানন্দ ও সংকীর্তন চলেছিল। আচার্য নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের আগ্রহে জাহ্নবা দেবী শ্রীখণ্ডে এসে দুদিন অবস্থান করেন এবং নিজে রন্ধন করে প্রভুর ভোগ দিয়ে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে নিজহাতে প্রসাদ পরিবেশন করে অবশেষে নিজে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বাৎসল্যময়ী মা জাহ্নবা দেবীকে শ্রীখণ্ডের ভক্তগণ ঈশ্বরী আখ্যা দিয়েছেন।

১৫০৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে রঘুনন্দনের দেহত্যাগ হলে তাঁর সুযোগ্য পুত্র ঠাকুর কানাই শ্রীখণ্ডে তাঁদের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত গৌর-গোপীনাথের সেবা করতে থাকেন। কিছুদিন পরে তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর একান্ত অনুগত ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণমিশ্রচরিতে দেখা যায়, অদ্বৈতপত্নী সীতা দেবী তাঁর দুই প্রিয় শিষ্য নন্দরাম ও যজ্ঞেশ্বরকে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার পূজা করতে উপদেশ দিচ্ছেন—''আচমি করিবে আগে নবদ্বীপ ধ্যান।/ তাহে বিষ্ণুপ্রিয়াসহ গৌরভগবান॥/ ভক্তি করি দুঁহু রূপ করিয়া চিন্তন।/ করিহ চৈতন্যমন্ত্রে চৈতন্য অর্চন॥"

কোন মানসিকতা থেকে নাগরবাদীরা প্রায় অসূর্যম্পশ্যা ব্রহ্মচারিণী তপস্বিনী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে রাধারানির স্থলাভিষিক্ত করে যুগলভজনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তা এক অজ্ঞাতপরিচয় পদকর্তার পদে স্পষ্ট হয়েছে—''যেমন রামের বামে সীতা সাজে, শ্যামের বামে রাই।/ আমার গৌর কেনে একা রবে, তাকে যুগল দেখতে চাই॥"

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের ঐকান্তিক প্রার্থনায় জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব। স্বমুখে গৌরাঙ্গ বলেছেন, ''তোমার সংকল্প লাগি অবতীর্ণ আমি/ বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি॥" (চৈতন্য ভাগবত) শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবাবেশে আচার্যকে বর প্রার্থনা করতে বললে অদ্বৈত চাইলেন—

''যদি ভক্তি বিলাইবা/ স্ত্রী, শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সব দিবা।/ বিদ্যা-ধন-কুল আদি তপস্যার বাদে/ তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জনে বাধে/ সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া/ চণ্ডাল নাচুক তব নামগুণ গায়্যা॥" আদ্বিজচণ্ডালে শ্রীচৈতন্যদেব নাম বিলিয়েছিলেন। মন্ত্রদাত্রীরূপে এবার নারীকেও গুরুর আসনে দেখা গেল। এ-ব্যাপারেও পথিকৃৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। কঠোর তপশ্চর্যায় গৃহাভ্যন্তরে সংগুপ্ত থেকেও তিনি সন্তানপ্রতিম সেবক বংশীবদনকে এবং তরুণ ভক্ত শ্রীনিবাসকে দীক্ষা দিয়েছেন। শ্রীনিবাসের আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের দিঙ্‌নির্দেশও করেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর অসহায় ভক্তবৃন্দের অনেকে তপস্বিনী মাতা বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখাপেক্ষা করে মিশ্রগৃহের বাইরে ছাউনি করে ছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে মা তাঁদের দর্শন ও প্রসাদ দিয়েছেন, নিতান্ত প্রয়োজনে উপদেশ দিয়ে চরিতার্থ করেছেন।

অদ্বৈতগৃহিণী সীতা দেবী স্নেহ এবং বিশেষত নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবা দেবী তপস্যা, ঔদার্য ও বাৎসল্যে বৈষ্ণবসমাজে গুরুরূপে ও মাতৃরূপে বিশেষ আদৃত। বাইশবাজারে বেত্রাঘাত সহ্য করার পর মুমূর্ষু যবন হরিদাস অদ্বৈতের কাছে উপস্থিত হলে সমাজবিধি, লোকাচার—সব উপেক্ষা করে সীতা দেবী পরমস্নেহে হরিদাসকে নিজ গৃহে স্থান দিলেন। আগেই সীতা দেবীর দুই প্রিয় শিষ্য নন্দরাম ও যজ্ঞেশ্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এঁদের তিনি গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ধ্যান করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এছাড়াও রুচি ও অধিকার অনুযায়ী নিজের দুই পরিচারিকা জঙ্গলী ও নন্দিনীকে তিনি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দেন। এছাড়াও দেবী মালিনী, নারায়ণী ও মাধবী দাসী প্রমুখ নারীরা তাঁদের ভজন-গৌরবে বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন; নারী বলে সামান্য অমর্যাদাটুকুও তাঁদের সইতে হয়নি।

সকলের মধ্যে অবশ্যই বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় জাহ্নবা দেবীর নাম। তিনি প্রকাশ্যে বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তরুণ ভক্তদের জীবনগঠন করেছেন। লক্ষ করার বিষয়, গৌরপারম্যবাদ, নাগরবাদ ইত্যাদি যে-মতবাদই প্রচারিত হোক না কেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত বিশিষ্ট নারীগণ তাঁদের সহজাত মাতৃভাবের প্রেরণায় গুরুরূপে সন্তানদের আধ্যাত্মিক পথনির্দেশ করেছেন। এই গভীর সহজভাবের পরিপুষ্টি ও প্রসার ঘটিয়েই নারীগণ কী সামাজিক কী আধ্যাত্মিক জীবনে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করেছেন। উত্তরকালে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ তাই শ্রীমা সারদার মাধ্যমে নারীর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের উপায়রূপে মাতৃভাবেরই পরাকাষ্ঠা স্থাপন করেছেন। স্বয়ং নানামতে ও পথে সিদ্ধিলাভ করেও জগদম্বার বালকরূপে আজীবন সন্তানভাব রক্ষা করেছেন। এর সুদূরপ্রসারী ফলে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন আবিলতার সম্ভাবনা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে।

শ্রীচৈতন্য সাধারণের জন্য নামসংকীর্তন প্রচার করলেও, তাঁর অনুশীলিত ও প্রচারিত রাগানুগাভক্তির যোগ্য অধিকারী তাঁরই চিহ্নিত সাড়ে তিন জন মাত্র। তিনি নিজে ছাড়া রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, শিখী মাহাতো ও তাঁর ভগ্নী মাধবী দাসী। একথা বলাই বাহুল্য, দুর্লভ ত্যাগ ও বৈরাগ্যের অনধিকারী সাধারণ মানুষের কাছে এই অত্যুচ্চ ভাব ও ভক্তির প্রকৃত তাৎপর্য চিরকাল অবোধ্য ও অস্পর্শ্যই থেকে যাবে। সেদিক দিয়ে গৌরপারম্যবাদীদের নামসংকীর্তন ও গৌরাঙ্গভজন এদের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করে ভজনানন্দ আস্বাদনের সুযোগ এনে দিয়েছে। সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করলেও একথা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না, গৌরপারম্যবাদী, বিশেষত নাগরবাদীদের প্রচারে সামাজিক সাম্য ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠাপক, তেজস্বী সংগঠক, কঠোর সংযমী, পুরুষসিংহ শ্রীচৈতন্যদেবের ঐতিহাসিক চরিত্র ও অসামান্য অবদান বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হল। উত্তরকালে নাগরবাদীদের ফেনিল উচ্ছ্বাস আবেগপ্রবণ বাঙালিকে অনিয়ন্ত্রিত ভাবালুতার ঘূর্ণাবর্তে ফেলে ক্রমে নিবীর্য, নিষ্ক্রিয় ও বিপথগামী করে তুলেছে। শাখাভেদে এইসব নানামত-জটিলতা ও বৈপরীত্য উপেক্ষা করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নেত্রীবৃন্দ পরমতপস্বিনী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে শিরোভূষণের মর্যাদা দিয়ে নিজেদের সহজাত মাতৃভাবের বিস্তারে ও চারিত্রিক মহিমায় নরনারী-নির্বিশেষে সকলের জীবনে আলোকবর্তিকারূপে শ্রেয়ঃপথ নির্দেশ করেছেন, এই কল্যাণকর সত্য আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। *(ক্রমশ)*